মনসামঙ্গল

মনসামঙ্গল বা পদ্মাপুরাণ মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের মঙ্গলকাব্য ধারার অন্যতম প্রধান কাব্য। এই ধারার অপর দুই প্রধান কাব্য চণ্ডীমঙ্গল ও ধর্মমঙ্গল কাব্যের তুলনায় মনসামঙ্গল প্রাচীনতর। এই কাব্যের আদি কবি কানাহরি দত্ত সম্ভবত ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ বা চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বর্তমান ছিলেন। অনুমিত হয়, মনসামঙ্গল কাব্যের উৎপত্তি পশ্চিমবঙ্গের রাঢ় অথবা বিহার অঞ্চলে। পরে পূর্ববঙ্গ ও উত্তরবঙ্গেও এই কাব্যের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায়। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, "বাংলা দেশের নানা অঞ্চলে বহু মনসামঙ্গল কাব্য পাওয়া গিয়েছে, তন্মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের কাব্যগুলি 'মনসামঙ্গল' ও পূর্ববঙ্গে প্রায়শই 'পদ্মাপুরাণ' নামে পরিচিত।"

মনসামঙ্গল কাব্যের প্রধান দেবতা সর্পদেবী মনসা। মনসা মূলগতভাবে অনার্য দেবী। ভারতের আদিবাসী ও অন্ত্যজ সমাজে সর্পদেবী মনসার পূজা সুপ্রচলিত। বিশেষজ্ঞদের অনুমান, খ্রিষ্টীয় দশম-একাদশ শতাব্দীতে বাংলায় মনসার পূজা প্রবর্তিত হয়। পদ্মপুরাণ, দেবীভাগবত পুরাণ ও ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ-এর মতো কয়েকটি আধুনিক উপপুরাণ গ্রন্থে দেবী মনসার উল্লেখ পাওয়া যায়; এই গ্রন্থগুলি অবশ্য খ্রিষ্টীয় একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীর পূর্বে রচিত হয়নি। লৌকিক দেবী হলেও কালক্রমে মনসা ব্রাহ্মণ্যতান্ত্রিক হিন্দুসমাজেও প্রতিপত্তি অর্জন করে; এমনকি চৈতন্যদেবের সমসাময়িক কালে শিক্ষিত বাঙালি সমাজেও মনসার পূজা প্রচলিত হয়।

মনসামঙ্গল একটি আখ্যানকাব্য। এই কাব্যের প্রধান আখ্যানটিও আবর্তিত হয়েছে মর্ত্যলোকে মনসার নিজ পূজা প্রচারের প্রয়াসকে কেন্দ্র করে। কাব্যের মূল উপজীব্য চাঁদ সদাগরের উপর দেবী মনসার অত্যাচার, চাঁদের পুত্র লখিন্দরের সর্পাঘাতে মৃত্যু ও পুত্রবধূ বেহুলার আত্মত্যাগের উপাখ্যান। এই কাব্যে সেযুগের হিন্দু বাঙালি সমাজের সমাজব্যবস্থা, অর্থনীতি, আচার-অনুষ্ঠান ইত্যাদি সম্পর্কে নানা অনুপুঙ্খ বর্ণনা পাওয়া যায়। চাঁদ সদাগর শুধুমাত্র এই কাব্যেরই নয়, বরং সমগ্র বাংলা সাহিত্যের অন্যতম বলিষ্ঠ চরিত্র; বেহুলা-লখিন্দরের করুণ উপাখ্যানটিও তার মানবিক আবেদনের কারণে আজও বাঙালি সমাজে জনপ্রিয়।

মনসামঙ্গল কাব্যের আদি কবি হরিদত্ত। বিজয়গুপ্ত এই কাব্যের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি। অন্যান্য কবিদের মধ্যে কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ, বিপ্রদাস পিপলাই প্রমুখের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আধুনিক কালে মনসামঙ্গল অবলম্বনে বিশিষ্ট নাট্যকার শম্ভু মিত্র চাঁদ বণিকের পালা নামে একটি নাটক রচনা করেন। চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ধারাবাহিকের আকারেও একাধিকবার এই পুনঃসৃজিত হয়েছে মনসামঙ্গল।

আখ্যানবস্তু

বিশিষ্ট মঙ্গলকাব্য বিশারদ আশুতোষ ভট্টাচার্য মনসামঙ্গল কাব্যের আখ্যানভাগটিকে "রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণ-নিরপেক্ষ একটি স্বাধীন লৌকিক কাহিনী" বলে বর্ণনা করেছেন। খ্রিষ্টীয় দশম-একাদশ শতাব্দী থেকে বাংলায় মনসার মূর্তিনির্মাণ শুরু হয়। মনসামঙ্গল কাব্যের মূল লৌকিক কাহিনিটি তারও আগে থেকে পল্লিগীতি ও ছড়ার আকারে বাংলার লোকসমাজে প্রচলিত ছিল বলে অনুমান করা হয়। খ্রিষ্টীয় ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দীতে এক লোককথাটি শক্তিশালী কবিদের নিপুণ হাতে পড়ে কাব্যকৃতির রূপ নেয়। ক্রমে তার মধ্যে নানা উপকাহিনি ও পৌরাণিক উপাখ্যানের সমাবেশ ঘটে।

মূল উপাখ্যান

মনসামঙ্গল কাব্যের মূল আখ্যানবস্তুটি নিম্নরূপ: চম্পক নগরের অধীশ্বর বণিক চাঁদ সদাগর। জগতপিতা শিবের মহাভক্ত। চাঁদ জগতপিতা শিবের থেকে মহাজ্ঞান লাভ করেছেন। মানুষের পূজা ব্যতীত দেবত্ব অর্জন সম্ভব নয়; তাই মনসা চাঁদের কাছে পূজা চাইলেন। শিবভিন্ন অপর কাউকে পূজা করতে চাঁদ প্রত্যাখ্যান করলেন। এমনকী পত্নী সোনেকার মনসার ঘটে হেঁতালদন্ডের বাড়ি মারেন। পরিণামে মনসা কৌশলে চাঁদের মহাজ্ঞান হরণ করেন এবং ছয়পুত্রকে বিষ দিয়ে হত্যা করেন। তারপর সমুদ্রপথে চাঁদের বাণিজ্যতরী সপ্তডিঙা মধুকর ডুবিয়ে চাঁদকে সর্বস্বান্ত করেন। চাঁদ কোনক্রমে প্রাণরক্ষা করেন। মনসা ছলনা করে স্বর্গের নর্তকদম্পতি অনিরুদ্ধ-ঊষাকে মর্ত্যে পাঠালেন। অনিরুদ্ধ চাঁদের ঘরে জন্মাল লখিন্দর রূপে, আর উজানী শহরে সাধু-বণিকের ঘরে বেহুলা রূপে ঊষা জন্ম নিল। বহুকাল পর চাঁদ সহায়-সম্বলহীনভাবে চম্পক নগরে উন্মত্ত পাগল বেশে করিল গমন। অবশেষে পিতা-পুত্রের মিলন ঘটল। বেহুলার সাথে লখিন্দরের বিবাহ স্থির হল। মনসা বৃদ্ধাবেশে এসে ছল করে বেহুলাকে শাপ দিল, বিভা রাতে খাইবা ভাতার। সাতালি পর্বতে লোহার বাসরঘর বানান হল। কিন্তু গোপনে মনসার নির্দেশে একটি ছিদ্র রাখা হল। ছিদ্র পথে কালনাগিনী ঢুকে লখাইকে দংশন করল। বেহুলা স্বামীর মৃতদেহ নিয়ে কলার মাজসে ভেসে পাড়ি দিল মনসার উদ্দেশ্যে। বহু বিপদ অতিক্রম করে অবশেষে নেতো ধোবানির সাহায্যে দেবপুরে পৌছে নাচের মাধ্যমে দেবতাদের তুষ্ট করল। তখন দেবতাদের আদেশে মনসা লখীন্দরের প্রাণ ফিরিয়ে দিল।বেহুলার

সতীত্বের মহিমায় মুগ্ধ হয়ে অবশেষে চাঁদ মনসার পুজো দিল। মর্ত্যবাসের মেয়াদ ফুরাতে বেহুলা-লখীন্দর আবার ইন্দ্রসভায় স্থান পেল।

কবি

সাহিত্যের ইতিহাসকার অধ্যাপক সুকুমার সেন ও অধ্যাপক অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা মনসামঙ্গল কাব্যগুলিকে মূলত তিনটি ধারায় বিভক্ত করেছেন। যেমন-

১। রাঢ়ের ধারা: বিপ্রদাস পিপলাই, কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ, বিষ্ণু পাল

২। পূর্ব বঙ্গের ধারা: বিজয়গুপ্ত, নারায়ণদেব, দ্বিজ বংশীদাস

৩। উত্তরবঙ্গ বা কামরূপীয় ধারা: তন্ত্রবিভূতি, জগজ্জীবন ঘোষাল, জীবন মৈত্র

বিজয়গুপ্ত

মনসামঙ্গলের একজন সর্বাধিক প্রচারিত কবি হিসাবে বিজয়গুপ্ত-এর খ্যাতি। তার মনসামঙ্গল (বা পদ্মাপুরাণ) বাংলার জনপ্রিয় কাব্যগুলির মধ্য অন্যতম। গল্পরস সৃজনে, করুণরস ও হাস্যরসের প্রয়োগে, সামাজিক ও রাষ্ট্রিক জীবনের পরিচয়ে, চরিত্র চিত্রণে এবং পাণ্ডিত্যের গুণে বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণ একটি জনপ্রিয় কাব্য। বিজয়গুপ্তের পূর্বে আমরা পাই আদি মঙ্গল কবি কানাহরি দত্ত ও বিপ্রদাস পিপলাইকে।

কবির পরিচয়

"রাজার পালনে প্রজা সুখে ভুঞ্জে নিত।

মুল্লুক ফতেয়াবাদ বাঙ্গরোড়া-তক্সিম।।

পশ্চিমে ঘাঘর নদী পূর্বে ঘণ্ডেশ্বর।

মধ্যে ফুল্লশ্রী গ্রাম পণ্ডিত নগর।।"

--- কাব্যের সূচনায় কবিকৃত এই আত্মকাহিনী থেকে জানা যায়, কবির নিবাস ছিল ফুল্লশ্রী গ্রামে (বর্তমান বাংলাদেশের বাখরগঞ্জ জেলায়)। পিতা সনাতন ও মাতা রুক্মিণী ("সনাতন তনয় রুক্মিণী গর্ভজাত")। এছাড়া তিনি ছিলেন সংস্কৃতজ্ঞ ও বৈষ্ণবভক্ত।

কাব্যের রচনাকাল

কাব্যের রচনাকাল নিয়ে গবেষকদের মধ্যে যথেষ্ট মতান্তর রয়েছে। কেননা বিভিন্ন পুথিতে ভিন্ন ভিন্ন তারিখের শ্লোক পাওয়া যায়। যেমন—

এক,

ঋতু শশী বেদশশী শক পরিমিত।

দুই,

ঋতুশূন্য বেদ শশী পরিমিত শক।

সুলতান হসেন সাহা নৃপতি তিলক।।

---১ম শ্লোক থেকে থেকে কাব্যের রচনাকাল পাওয়া যায় ১৪৯৪-৯৫ খ্রিঃ। কিন্তু প্রাচীন পুথিতে উল্লিখিত দ্বিতীয় শ্লোকটি পাওয়া যাওয়ার কারণে বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে। ২য় শ্লোক অনুযায়ী কাব্যের রচনাকাল হয় ১৪৮৪-৮৫ খ্রিঃ। সমালোচকের মতে প্রাচীন পুথিতে পাওয়া এই শ্লোকটিই আসল এবং এই সময়ে বাংলার শাসক ছিলেন জলালউদ্দীন ফতেহ শাহ, আলাউদ্দীন হোসেন শাহ নয়।

কাব্য প্রসঙ্গ

বিজয়গুপ্তের কাব্য পূর্ববঙ্গে সর্বাধিক প্রচারিত হয়েছিল। ১৩০৩ বঙ্গাব্দে প্যারীমোহন দাশগুপ্ত সর্বপ্রথম বরিশাল থেকে বিজয়গুপ্তের "পদ্মাপুরাণ" প্রকাশ করেন। প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে পুথির ভাষা নিয়ে সাহিত্যের গবেষকদের মধ্যে সংশয় দানা বাঁধে। যাইহোক বিজয়গুপ্তের কৃতিত্ব এতে কম হওয়ার নয়। সমকালীন অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রনৈতিক ও সামাজিক চিত্র এই কাব্যে স্থান পেয়েছে। চরিত্র-চিত্রণের দিক দিয়েও তার কৃতিত্ব জথেস্ত। শিব, চণ্ডী, মনসা সাধারণ মানব-মানবীর মতো। কিন্তু চাঁদ চরিত্রের পরিকল্পনায় তার ত্রুটি থেকে গেছে। তাই সমালোচক অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, "দেবীর মহিমা প্রচারের জন্য বিজয়গুপ্ত চাঁদের চরিত্রটির পরিণতি নষ্ট করিয়া কাব্যের ভরাডুবি করিয়াছেন।" তবে এ ত্রুটি সামান্যই । আশুতোষ ভট্টাচার্য বিজয়গুপ্তের যথার্থ মূল্যায়ণ করেছেন এই বলে, " বিজয়গুপ্ত দেবতার মাহাত্ম্য রচনা করেন নাই, মানবেরই মঙ্গলগান গাহিয়াছেন ।"

নারায়ণদেব

নারায়ণদেব মধ্যযুগের মনসামঙ্গল কাব্যের একজন অত্যন্ত জনপ্রিয় কবি। তিনি তার যে সংক্ষিপ্ত আত্মপরিচয় দিয়েছেন তা থেকে জানা যায়, তার বৃদ্ধ পিতামহ উদ্ধারণদেব রাঢ়দেশ ত্যাগ করে পূর্ববঙ্গের বোরগ্রামে বসতি স্থাপন করেছিলেন। বোরগ্রাম ময়মনসিংহ জেলার পূর্বসীমান্তবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত। অনুমিত হয় তিনি চৈতন্যপূর্ববর্তী যুগে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তার রচিত মনসামঙ্গল কাব্য আসামের ব্রহ্মপুত্র এবং সুরমা উপত্যকা , উভয় অঞ্চলেই ব্যাপক প্রচার লাভ করেছিল। এর ফলে অসমিয়া ভাষায় তার কাব্যটি আনুপূর্বিক পরিবর্তিত হয়ে গেছে। এমন কি কেউ কেউ তাকে অসমিয়া ভাষার আদি কবির মর্যাদা দিয়েছেন।

জন্ম ও বংশ পরিচয়

নারায়ণদেব তার বেশিরভাগ পুঁথিতে সংক্ষেপে আত্মজীবনীর উল্লেখ করেছেন। যদিও এক পুঁথি থেকে অন্য পুঁথির নানা বৈষম্য আছে তবুও মোটামুটি গ্রহণযোগ্য সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বলা হয় তিনি রাঢ়দেশের এক কায়স্থ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন; তার পিতামহ উদ্ধারণদেব (উদ্ধবরাম) রাঢ়দেশ ত্যাগ করে ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত বোরগ্রামে বসতি স্থাপন করেছিলেন। পিতার নাম নরসিংহ আর মাতা রুক্মিণী । কবিরা ছিলেন কায়স্থ এবং মৌদ্গল্য গোত্র। কবির জন্মস্থান নিয়ে এক সময় খুব বিতর্ক ছিল। ব্রহ্মপুত্রের তীরে অবস্থিত বোরগ্রাম বর্তমানে ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত, কিন্তু কোনো একসময় শ্রীহট্টবাসীরা নারায়ণদেবকে শ্রীহট্টের অধিবাসী বলে দাবী করতেন। এর কারণ হিসাবে তারা পূর্বে বোরগ্রামের শ্রীহট্টের অন্তর্ভুক্তির কথা উল্লেখ করতেন। ১৩১৮ সনের রংপুর সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী অনেক তথ্য প্রমাণসহ কবিকে ময়মনসিংহবাসী হিসাবে প্রমাণ করতে তৎপর হন, কিন্তু এর পাল্টা হিসাবে শ্রীহট্টবাসী বিরজাকান্ত ঘোষ ১৩১৯ সনে রংপুর সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় নারায়ণদেবকে শ্রীহট্টের অধিবাসী হিসাবে প্রমাণ করার চেষ্টা করেন। ১৩২০ সনে 'সৌরভ' পত্রিকার মাঘ সংখ্যায় রমানাথ চক্রবর্তী সতীশচন্দ্রকে সমর্থন করেন। আবার অচ্যুতচরণ চৌধুরী 'শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত' শীর্ষক গ্রন্থে নারায়ণদেবকে আসামবাসী বলে দাবী করেছিলেন।

মনসামঙ্গলের কবি হিসাবে নারায়ণদেব

নারায়ণদেবের উপাধি ছিল 'সুকবি-বল্লভ'। তিনি মনসামঙ্গল কাব্যের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি কিনা তা নিয়ে তর্ক-বিতর্কের অবকাশ থাকলেও একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে তিনি বাংলা ও আসামের অন্যতম জনপ্রিয় কবি ছিলেন। তার কাব্যের সহজ শিল্পরস তাকে মধ্যযুগের অন্যতম প্রভাবশালী কবি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। নারায়ণদেবের বিশিষ্ঠতা এইখানে যে তিনি কালিকাপুরাণ, শিবপুরাণ, কালিদাসের 'কুমারসম্ভব' প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থের দ্বারা প্রভাবিত হয়েও আপন প্রচেষ্টায় তার কাহিনিকে বিশাল রূপদান করেছিলেন ; এদিক থেকে তিনি মনসামঙ্গল কাব্যের অন্যান্য কবি যেমন বিজয়গুপ্ত, বিপ্রদাস পিপলাই কিংবা কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের থেকে অনেকখানি এগিয়ে। নারায়ণদেব নামাঙ্কিত একাধিক পুঁথি পাওয়া গেছে । ১৬৯৫ খ্রিষ্টাব্দে লিখিত একখানি প্রাচীন পুঁথির আলোকচিত্র কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথি বিভাগে রক্ষিত আছে। নারায়ণদেবের অনেক পুঁথিতে অন্য কবি বা গায়েনের ভণিতা আছে, কিন্তু মুল কাহিনির সাথে তার খুব ভিন্নতা নেই। তাই তার পুঁথিকে অনেকেই নির্ভরযোগ্য বলে গ্রহণ করে থাকেন। সমালোচক আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন, --" নারায়ণ দেবের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে , তাঁহার কাব্যের পরিসমাপ্তির পরিকল্পনা চাঁদ সদাগরের চরিত্রের আনুপূর্বিক সামঞ্জস্য রক্ষায় সার্থক হইয়াছে। তিনিই চাঁদ সদাগরকে দিয়া বাম হস্তে মুখ না ফিরাইয়া একটি ফুল দিয়া পূজা করিয়াছেন, কিন্তু অন্যান্য কোনো কোনো কবি , এমনকি , বিজয়গুপ্তও তাঁহাকে দিয়া ঘটা করিয়া মনসার পূজা করাইয়া কাব্যের উপসংহার করিয়াছেন। এই দিক দিয়া নারায়ণ দেবের রচনায় কাব্যগুণ অধিক প্রকাশ পাইয়াছে বলিতে হইবে।" তাছাড়া নারায়ণ দেব যে প্রতিভাশালী কবি ছিলেন তার বড় প্রমাণ সপ্তদশ শতকের কবি কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ তার কাব্যের প্রারম্ভে নারায়ণ

দেবের বন্দনা করেছেন এইভাবে--

ব্যাস বাল্মীকি মুনি নারায়ণ তত্ব জানি

তোমাকে সেবিয়া হৈল কবি ।।

কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ

বাংলার অনেক কবি সর্প দেবতা মনসার মাহাত্ম্যজ্ঞাপক মঙ্গলকাব্য রচনা করেছেন। এদের মধ্যে কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ অন্যতম। ইনি রাঢ় দেশের অধিবাসী ছিলেন। তবে শুধুমাত্র রাঢ়বঙ্গেই নয় তার কাব্য পূর্ববঙ্গেও বেশ প্রচলিত ছিল। পূর্ববঙ্গে তার কাব্য " ক্ষেমানন্দী " নামে পরিচিত। অনুমিত হয় কাব্যটির রচনাকাল সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগ। তবে অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায়-এর মতে ক্ষেমানন্দ ১৭০৮-০৯ খৃঃ-এর বেশ কিছুকাল আগেই কাব্য রচনা করেছিলেন। কেতকাদাসের কাব্যে 'চন্ডীমঙ্গল' ও 'রামায়ণ' এর প্রভাব রয়েছে বলে মনে করা হয়।

আত্মপরিচয়

ক্ষেমানন্দের পুর্ণাঙ্গ আত্মকাহিনী থেকে জানা যায়, তিনি জাতিতে কায়স্থ, পিতা শঙ্কর মন্ডল এবং গ্রামের নাম "কাঁথরা" বর্তমানে "কেতেরা"। বর্তমানে হুগলী জেলার তারকেশ্বর থানায় এই নামে গ্রাম এখনো রয়েছে। প্রশ্ন জাগে ক্ষেমানন্দ জাতিতে কী ছিলেন ? সুকুমার সেনের মতে, তিনি ছিলেন জাতিতে কায়স্থ। কিন্তু এব্যাপারে প্রশ্ন জাগে কায়স্থদের মধ্যে মন্ডল পদবীধারী থাকে কি না ? তাই বলা চলে তিনি কায়স্থ না হলেও মন্ডল পদবীধারী কোনও জাতির অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। অন্যান্য মঙ্গল্ কবিদের মতো তিনি স্বপ্নাদেশ প্রাপ্তিতে মঙ্গল্ কাব্য রচনা করেননি। তিনি আত্মকাহিনীতে বলেছেন, দেবী মনসা মুচিনীর বেশে কবিকে দেখা দিয়ে পরে স্বরূপে দেখা দেন ও কাব্য রচনার আদেশ দেন।

কবির নাম বিতর্ক

কবির নাম নিয়েও বিতর্কের শেষ নেই। দীনেশচন্দ্র সেন-এর মতে, কেতকাদাস ও ক্ষেমানন্দ দুইজন পৃথক ব্যক্তি। অন্যদিকে সুকুমার সেন-এর মত, কবির আসল নাম কেতকাদাস ও ক্ষেমানন্দ তার উপাধি। তবে কবির প্রকৃত নাম যে ক্ষেমানন্দ তা নিয়ে অনেক ঐতিহাসিক একমত।

কাব্য পরিচয়

ক্ষেমানন্দ শক্তিশালী কবি ছিলেন। তার মনসামঙ্গল (মনসার ভাসান) পাঁচটি পালায় বিভক্ত -- মথন, ঊষাহরণ, রাখালপূজা, ধন্বন্তরি ও বেহুলা-লখিন্দর। এই পাঁচটি পালার মধ্য শেষেরটিই প্রধান। এই পালাটির অন্য নাম জাগরন পালা। এই কাব্যে কবি দেবী মনসাকে কেতকা নামে অভিহিত করেছেন -- " কিয়া পাতে জন্ম হৈল কেতকা সুন্দরী "। এছাড়াও কবি এই কাব্যে বেহুলার ভাসান পথের যে ২২টি ঘাট বা গ্রামের নাম উল্লেখ করেছেন তার মধ্যে ১৪টি ঘাট বা গ্রাম এখনো দামোদর ও তার শাখা বেহুলা নদীর উভয় তীরে অবস্থিত। এ থেকে কবির ভৌগোলিক জ্ঞান সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়।

বিপ্রদাস পিপলাই

বিপ্রদাস পিপলাই (মতান্তরে বিপ্রদাস পিপিলাই) ছিলেন পঞ্চদশ শতাব্দীর এক বিশিষ্ট বাঙালি কবি। তিনি অধুনা পশ্চিমবঙ্গের উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার অন্তর্গত বাদুড়িয়া-বাটাগ্রামের বাসিন্দা মুকুন্দ পিপলাইয়ের পুত্র ছিলেন। বিপ্রদাস মনসা-পাঁচালীর সবচেয়ে পুরনো কবি। মনসার সম্পূর্ণ কাহিনী একমাত্র তার কাব্যেই লভ্য। গৌড়ের রাজা হোসেন শাহের সময়ে ১৪৯৫-৯৬ সালে এই 'মনসাবিজয়' কাব্য রচিত হয়।

মনসাবিজয় কাব্য

বিপ্রদাস পিপলাই ছিলেন সর্পদেবী মনসার মাহাত্ম্যপ্রচারের উদ্দেশ্যে রচিত মনসামঙ্গল কাব্যধারার অন্যতম প্রধান কবি। তার কাব্যের তিনটি পুথি আবিষ্কৃত হয়েছে। ১৮৯৭ সালে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তদাবধি আবিষ্কৃত দুটি পুথির উপর ভিত্তি করে তার কাব্যের একটি অসমাপ্ত সংস্করণ সম্পাদনা করে প্রকাশ করেন। ১৯৫৩ সালে ভাষাতাত্ত্বিক সুকুমার সেন বিপ্রদাস পিপলাইয়ের মনসাবিজয় নামে তার কাব্যের একটি সম্পূর্ণ সংস্করণ সম্পাদনা করে প্রকাশ করেন। এই সংস্করণটি এশিয়াটিক সোসাইটির বিবলিওথেকা ইন্ডিকা গ্রন্থমালার অন্তর্গত ছিল। এই সংস্করণটি প্রস্তুত করা হয় প্রাপ্ত তিনটি পুথির ভিত্তিতেই। এই পুথিগুলি থেকে গ্রন্থরচনার যে তারিখটি পাওয়া যায় সেটি হল ১৪১৭ শকাব্দ (১৪৯৫-৯৬ খ্রিষ্টাব্দ)। বরিশালের বিজয়গুপ্তও একই সময়ে তার মনসামঙ্গল কাব্য রচনা করেছিলেন।

কাব্যের বিষয়বস্তু

দেবখন্ড

ধর্মের আদেশে কালিদহে পদ্মফুল তুলবার সময় পদ্মপাতায় শিবের বীর্যপাত ঘটে।বীর্যবিন্দু জলে পড়লে নাগরাজ বাসুকির মাতা তা থেকে পুতুল বানিয়ে জীবন্যাস করেন ; জন্ম হয় পদ্মাবতীর।বাসুকি এই মেয়েটিকে নাগেদের বিষভান্ডারের অধীশ্বরী করে দেন। শিবের মানসকর্মের জন্য জন্ম হওয়ায় শিব কন্যার নাম রাখেন মনসা। ব্রহ্মজ্ঞান দান করে শিব মনসাকে ঘরে নিয়ে এলে শিব-পত্নী চন্ডী তাকে সতীন ভেবে ভুল করেন এবং কুশের বাণ দিয়ে মনসার একচোখ কানা করে দেন।মনসা বিষ ছুড়ে চন্ডীকে মেরে ফেলেন কিন্তু সবার অনুরোধে আবার প্রাণ ফিরিয়ে দেন। চন্ডীর রোষ থেকে মনসাকে বাঁচাতে শিব তাকে সিজুয়া পর্বতে কন্যা নেতার কাছে রেখে এলেন। সমুদ্রমন্থনকালে উথ্থিত বিষ শিব পান করে মৃতবৎ হয়ে পড়লে চন্ডীর অনুরোধে মনসা শিবের বিষহরণ করলেন। এখন থেকে মনসা দেবসমাজে সম্মানের স্থান পেলেন। মনসার বিবাহ হল জরৎকারু মুনির সাথে,তাদের পুত্র হল আস্তিক।

বণিকখন্ড

চম্পক নগরের অধীশ্বর বণিক চাঁদ সদাগর।শিবের মহাভক্ত চাঁদ শিবের থেকে মহাজ্ঞান লাভ করেছেন। মানুষের পূজা ব্যতীত দেবত্ব অর্জন সম্ভব নয়;তাই মনসা চাঁদের কাছে পূজা চাইলেন।শিবভিন্ন অপর কাউকে পূজা করতে চাঁদ প্রত্যাখ্যান করলেন। এমনকী পত্নী সনকার মনসার ঘটে হেঁতালদন্ডের বাড়ি মারেন। পরিণামে মনসা কৌশলে চাঁদের মহাজ্ঞান হরণ করেন এবং ছয়পুত্রকে বিষ দিয়ে হত্যা করেন।তারপর সমুদ্রপথে চাঁদের বাণিজ্যতরী সপ্তডিঙা মধুকর ডুবিয়ে চাঁদকে সর্বস্বান্ত করেন।চাঁদ কোনক্রমে প্রাণরক্ষা করেন। মনসা ছলনা করে স্বর্গের নর্তকদম্পতি অনিরুদ্ধ-ঊষাকে মর্ত্যে পাঠালেন। অনিরুদ্ধ চাঁদের ঘরে জন্মাল লখিন্দর রূপে, আর উজানী শহরে সাধু-বণিকের ঘরে বেহুলা রুপে ঊষা জন্ম নিল। বহুকাল পর চাঁদ সহায়-সম্বলহীনভাবে চম্পক নগরে উন্মত্ত পাগল বেশে করিল গমন।অবশেষে পিতা-পুত্রের মিলন ঘটল। বেহুলার সাথে লখিন্দরের বিবাহ স্থির হল ।মনসা বৃদ্ধাবেশে এসে ছল করে বেহুলাকে শাপ দিল, বিভা রাতে খাইবা ভাতার। সাতালি পর্বতে লোহার বাসরঘর বানান হল।কিন্তু গোপনে মনসার নির্দেশে একটি ছিদ্র রাখা হল।ছিদ্র পথে কালনাগিনী ঢুকে লখাইকে দংশন করল। বেহুলা স্বামীর মৃতদেহ নিয়ে কলার মাজসে ভেসে পাড়ি দিল মনসার উদ্দেশে।বহু বিপদ অতিক্রম করে অবশেষে নেতো ধোবানির সাহায্যে দেবপুরে পৌছে নাচের মাধ্যমে দেবতাদের তুষ্ট করল।তখন দেবতাদের আদেশে মনসা লখীন্দরের প্রাণ ফিরিয়ে দিল।বেহুলার সতীত্বের মহিমায় মুগ্ধ হয়ে অবশেষে চাঁদ মনসার পুজো দিল। মর্ত্যবাসের মেয়াদ ফুরাতে বেহুলা-লখীন্দর আবার ইন্দ্রসভায় স্থান পেল।

গুরুত্ব

বিপ্রদাসের কাব্যের বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয় হল চাঁদ সদাগরের বাণিজ্যযাত্রা পথের বিস্তারিত বিবরণ। এই বিবরণ থেকে তৎকালীন সপ্তগ্রাম এবং হুগলি-সরস্বতী নদীর নিম্ন অববাহিকার একটি স্পষ্ট চিত্র পাওয়া যায়।খড়দহ, চুচুড়া, কলিকাতা, দেগঙ্গা,কোন্নগর, নৈহাটি প্রভৃতি নদী বন্দরের নাম তার কাব্যে উল্লিখিত হয়েছে।

তথ্যসূত্র : ইন্টারনেট (উইকিপিডিয়া)